বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আজ জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের এদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়গণ শাহাদত বরণ করেন। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এক কলঙ্কিত অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমান শহিদ হন। একই সাথে শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ অনেক নিকট আত্মীয়। এ নৃশংস ঘটনা কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপস করেননি। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। দীর্ঘ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই মহান নেতা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই আমাদের দায়িত্ব হবে জ্ঞানগরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। তাহলেই আমরা চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো। ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। এ দুটি জাতীয় অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। আমি মনে করি এ দু'টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিজেদেরকে নিবেদিত করতে পারবে।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প-২০২১' ও 'রূপকল্প-২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিয়োগ করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

‘মুছিবেনা চিহ্ন তার শত যুগান্তরে’

ওবায়দুল কাদের এমপি

'পাখি ডাকা ছায়া ঢাকা' টুঙ্গিপাড়ার ফুলে ফুলে ছাওয়া বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে কত কথা, কত স্মৃতি মনে পড়ে আজ! এখানে শেষ ঘুমে শুয়ে আছেন আমাদের ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মনে হয় গোটা বাংলাদেশ ঘুমিয়ে আছে বীরত্বগাথায় ভরপুর স্বাধীনতার সোনালি ইতিহাস বুকে জড়িয়ে। এখানে, এই নদীর কলতানে মুখরিত বনবীথির ছায়াতলে যাঁর পরম গৌরবের জন্ম, আবার এই মাটিতেই রক্তাক্ত ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে তাঁর শেষ বিশ্রাম। যে মহামানবের আজন্ম সাধনার সোনালি ফসল আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ, ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট ভোরে তাঁর রক্তে ভিজে গেছে বাংলার শ্যামল মাটি। কী নির্মম উপেক্ষায় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিলো, সে কথা ভাবতেও মনটা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বন্দুকধারী প্রহরায় মাত্র ১৮ জন গ্রামবাসী জানাজায় শরিক হতে পেরেছিলো নিহত বঙ্গবন্ধুর। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতির দাফনকার্য সম্পন্ন হয়েছিলো ৫৭০ সাবান আর রিলিফের কাপড় দিয়ে।

অদূরে দাঁড়িয়ে অসহায় আর্তনাদে নিরবে চোখের পানি ফেলেছিলো হাজার হাজার শোকার্ত মানুষ। অন্তিমযাত্রায় ভারতের মহাত্মা গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীর মতো জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত ফুলে ফুলে ঢাকা তাঁর কফিন পায়নি সামান্যতম রাষ্ট্রীয় মর্যাদা। বিউগলে বেজে ওঠেনি শেষ বিদায়ের করুণ সুর। বঙ্গবন্ধুর যৌবনের উত্তাপ দিয়ে গড়া স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীর জাতীয় মাজারে জাতির পিতার সমাধির জন্য দু'গজ জমিও জুটলো না। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতার একই বদনসিব যে, তাঁর মরদেহ সমাহিত হলো রাজধানী থেকে অনেক দূরের অজপাড়া টুঙ্গিপাড়ায়। যেমন অযত্ন অবহেলায় সমাহিত হয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে রাজধানী সান্তিয়াগো থেকে অনেক দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে চিলির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার মতোই বঙ্গবন্ধুর বুলেটবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ খুনিদের উল্লাস নৃত্যের মধ্য দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিলো টুঙ্গিপাড়ায়। হতবাক বিস্ময়ে শোকবিহ্বল বাংলাদেশের মানুষ পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট প্রত্যক্ষ করলেন আরেক পলাশী ষড়যন্ত্রের পুনরাভিনয়। দেশপ্রেমিক সিরাজউদ্দৌলাকে নারীলোলুপ দুশ্চরিত্র, লম্পট শাসক বলে কত কলঙ্কের কালিমা লেপন করা হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধুও তখন খুনিদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র হত্যাকারী, দুর্নীতিবাজ। তাঁর হত্যাকারীদের 'সূর্যসৈনিক' উপাধিতে ভূষিত করা হয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসন থেকে। তারপরের ইতিহাসও সবার জানা। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের পুরস্কৃত করা হলো নিরাপদে দেশ ত্যাগের ব্যবস্থা করে, বিদেশি দূতাবাসে বাংলাদেশের কূটনৈতিক পদমর্যাদা দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচাররোধকারী ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্সকে লাখো শহিদের রক্তমূল্যে অর্জিত বাংলাদেশের সংবিধানের আইনে পরিণত করলেন মুক্তিযুদ্ধেরই একজন সেক্টর কমান্ডার জেঃ জিয়াউর রহমান।

এই সংবিধানেই আবার সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করা হলো তিরিশ লাখ শহিদের লাশের নীচে একাত্তরের সমাধিস্থ চিরাচরিত পাকিস্তানি মার্কা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে সেই সুবাদে পুনর্বাসিত হলো স্বাধীনতার পরাজিত নরঘাতক শক্তি তথা পাকহানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসররা। বন্দুক উঁচিয়ে সংবিধান থেকে হটিয়ে দেওয়া হলো মুক্তিযুদ্ধের মুল্যবোধগুলোকে। সুপরিকল্পিতভাবে ছুরি চালানো হলো স্বাধীনতার আদর্শের ওপর। নির্বাসনে পাঠানো হলো মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি জয় বাংলাকে। বিজয়ের নায়ককে হত্যা করে একে একে নস্যাৎ করা হলো স্বাধীনতার সুফলগুলো। বঙ্গবন্ধু-উত্তর বাংলাদেশ এভাবে উপহার পেলো হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি।

ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু তো একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে গেলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে। তাঁর বিরুদ্ধে অবিরাম ব্যবহৃত হলো চরিত্রহননের কত ছোরা! অবমূল্যায়নের নরুন দিয়ে বারে বারে ছেদন করা হলো তাঁকে। দেয়ালে টাঙানো তাঁর ছবি নামিয়ে ফেলা হলো চরম অপমানে। কতবার ছেঁড়া হলো ছবির মুজিবকে! পদদলিত করা হলো তাঁর কত প্রতিকৃতি! স্বাধীনতা দিবসে, বিজয় দিবসে পাবলিক মিডিয়ায় তিনি অনুচ্চারিত নাম। রাষ্ট্রীয় উৎসব মঞ্চে স্বাধীনতা নাটক আছে, অথচ এই নাটকের নায়ক যেন কেউ নেই। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাস্থল পরিণত হলো শিশুপার্ক ও গাছগাছালির শোভায়। বঙ্গবন্ধুকে ভুলিয়ে দিতে শিশু-কিশোরদের পাঠ্যপুস্তক থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হলো তাঁর অমর বীরত্বগাথার ইতিহাস। এভাবে পরিকল্পিতভাবে বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে করা হলো বিকৃত। ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে মাটিচাপাও দেওয়া হয়েছিল তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়ার সুচতুর কৌশলে।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে বর্বরভাবে হত্যা করে।

জাতির পিতার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, দশ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকেও ঘৃণ্য ঘাতকরা এ দিনে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিলও নিহত হন। ঘাতকদের কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজনও হতাহত হন।

জাতীয় শোক দিবসে আমি মহান আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের সকল শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

জাতির পিতার দূরদর্শী, সাহসী এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সংগীত।

সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র তাঁকে হত্যা করে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। ঘাতকদের উদ্দেশ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র '৭৫ এর ১৫ আগস্টের পর থেকেই হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথও বন্ধ করে দেয়।

জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে। বিদেশে দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে। পরবর্তী বিএনপি-জামাত সরকারও একই পথ অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে। অতীতের জঞ্জাল সরিয়ে এই ৫ বছরে দেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। বাংলাদেশের মানুষের জন্য এ সময়টা ছিল একটি স্বর্ণযুগ। আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচার শুরু করি। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে জাতির পিতা হত্যার বিচার কাজ বন্ধ করে দেয়।

দেশের জনগণ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে আমরা দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি-জামাত জোটের নির্বাচন বানচালের পায়তারাকে জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে ভোট দিয়ে দেশের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। আবারও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে।

গত সাড়ে ১০ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমরা সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ বন্ধ হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্র বিরোধী চক্রের যে কোনো অপতৎপরতা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সকলের প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। আসুন, আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করি। তাঁর ত্যাগ এবং তিতিক্ষার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনাদর্শ ধারণ করে সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু ও শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

রফিকুল ইসলাম

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী ও তাদের গোলাম রাজাকার, আল্‌বদর ও আল্‌শামস্ অনুচরদের নৃশংসতায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালি নিহত, কয়েক লক্ষ বাঙালি মা বোন নির্যাতিত ও এক কোটি বাঙালি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ইতিহাসে এমন পৈশাচিকতা, বর্বরতা ও নৃশংসতার নজির মেলা ভার। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, দখলদার পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী তাদের বাঙালি নিধন অভিযান শুরু ও শেষ করেছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী নিধনের মাধ্যমে। সে কারণেই পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকায় অভিযান শুরু করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, শহিদ মিনার এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিস আক্রমণের মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কাল পাকিস্তান সামরিক বাহিনী তাদের দাসানুদাস শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল্‌বদর ও আল্‌শামস্ এর সহযোগিতায় সারা বাংলাদেশে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী এবং নারীদের ওপর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ নৃশংসতম বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন চালিয়েছিল। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের পাইকারিভাবে নিধনের যে নৃশংস প্রক্রিয়া পাকিস্তান চালিয়েছিল তাতে অগণিত মনীষী শিকার হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য- শিক্ষাবিদ ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, প্রফেসর মুনিরুজ্জামান, ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মামুন মাহমুদ, শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেক, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম, উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা মুহম্মদ শামসুল হক, শিক্ষাবিদ ডক্টর ফজলুর রহমান, অধ্যাপক মুকতাদির, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাজী আলী ঈমাম, কবি মেহেরুন্নেসা, সাহিত্যিক-সাংবাদিক শহিদ সাবের, শিক্ষাবিদ প্রফেসর হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক সুখরঞ্জণ সমাদ্দার, প্রকৌশলী এ. কে. এম. শামসুদ্দিন, চিকিৎসক ডা. শামসুদ্দিন, রাজনীতিক সায়ীদুল হাসান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুরকার ও গায়ক আল্‌তাফ মাহমুদ, যন্ত্রশিল্পী হাফিজুর রহমান, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুম, সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন, সৈয়দ নাজমুল হক, নিজামউদ্দিন আহমেদ, আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা, সাহিত্যিক-সাংবাদিক সেলিনা হোসেন, বিজ্ঞানী ডক্টর আমিন উদ্দিন, ডক্টর সিদ্দিক আহমদ, ডক্টর আবুল কালাম আজাদ, শিক্ষাবিদ ডক্টর ফয়জুল মহী, অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল হক খান, রাশীদুল হাসান, আনোয়ার পাশা, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক গিয়াসুদ্দিন আহমদ, ডক্টর আবুল খায়ের, চিকিৎসক ডাক্তার মোহাম্মদ মোর্তজা, ডাক্তার আলীম চৌধুরী, ডাক্তার ফজলে রাব্বী, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার, চিত্রপরিচালক জহির রায়হান এবং দানবীর রনদাপ্রসাদ সাহা। পাকিস্তানিদের হাতে নিহত শহিদ বুদ্ধিজীবীদের যে অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো তা থেকে বোঝা যাবে পাকিস্তান সরকার ও তার দোসরেরা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ওপর কী পরিকল্পিত নৃশংসতা চালিয়েছিল।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল পাকিস্তান বাহিনী। তারপর শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল্‌বদর ও আল্‌শামস্ বাহিনী গঠিত হবার পর পাকিস্তান বাহিনী ঐ গোলামদের সাহায্যে সারাদেশে বুদ্ধিজীবী নিধন ও নারী নির্যাতন চালিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকিস্তান বাহিনী মরণকামড় দিয়েছিল তালিকাবদ্ধ বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধনের মাধ্যমে। এই বর্বরোচিত কাজটি তারা করিয়েছিল তাদের এদেশীয় গোলাম, রাজাকার আল্‌বদর ও আল্‌শামস্ বাহিনীর দ্বারা। ঢাকায় বুদ্ধিজীবী নিধন ও নির্যাতনের জন্য মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে একটি 'টর্চার সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছিল। ঘোরতর যুদ্ধ, কারফিউ ও ব্ল্যাকআউটের মধ্যেও বুদ্ধিজীবীদের গোপন আশ্রয় থেকে তুলে নিয়ে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজের টর্চার সেন্টারে নির্যাতনের পর তাদের রায়েরবাজার বধ্যভূমি এবং মিরপুর গোরস্থানে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তখন ঢাকায় বেড়িবাঁধ ছিল না। রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে ছিল জলাভূমি। মিরপুর গোরস্থানে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের দিয়ে সেখানে গণকবর খুঁড়িয়ে পুঁতে রাখা হয়েছিল। রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিজীবীদের লাশ চিল, শকুন ও শৃগাল-কুকুরের আহার্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। রায়েরবাজার বধ্যভূমিটি ১৬ ডিসেম্বরের পরপরই আবিষ্কৃত হয়েছিল। মিরপুর বধ্যভূমি পাওয়া গিয়েছিল আরও কিছুকাল পরে। সেখানে পাওয়া লাশগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। কিন্তু রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পড়ে থাকা বিকৃত লাশের অনেকগুলি শনাক্ত করা যায়নি। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের আগে ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন শুরু হয়। তখন থেকে রায়েরবাজার বধ্যভূমি ও মিরপুর গোরস্থানে মানুষের ঢল নামে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও যথাযথ মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। স্মরণীয় যে, ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ মেহেরপুর আম্রকাননে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল, সে সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতির পদে আসীন এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ভারত থেকে প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করা হয়। পাকিস্তানে আটকেপড়া ষাট হাজার বাঙালি, সরকারি কর্মচারী, সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং বিভিন্ন পেশাজীবীকে সপরিবারে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশক্রমে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেন। যুদ্ধপরাধীদের গ্রেফতার ও বিচারকার্য শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দ্রুত স্বাধীন বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়ন এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত মা-বোনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য খেতাব প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ শহিদের স্মৃতিকে ভাস্বর করে রাখার জন্য সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পরিকল্পিত স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি জাতীয়করণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বায়ত্বশাসন দেবার ব্যবস্থা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য তিনি 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তিনি সপরিবারে বাংলাদেশে এনে ধানমন্ডিতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী পালন করি কবিকে নিয়ে।

বস্তুত কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে স্বাধীন বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের নেপথ্য ভূমিকা ছিল। ড. নীলিমা ইব্রাহিমের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে বাংলা বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন নজরুলকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য। বঙ্গবন্ধু এই আবেদনে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নজরুলকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিকে ভাস্বর করে রাখার অভিপ্রায়ে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা বিভাগ থেকে আগের সেই প্রতিনিধিদল আবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রায়ের বাজার বা মিরপুর বধ্যভূমিতে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান।

বঙ্গবন্ধু এই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই শহিদদের মধ্যে প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন এবং সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাংলা বিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের নির্দেশনা দিলেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। তিনি একথাও জানিয়ে দিলেন যে ১৯৭৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে তিনি স্বয়ং স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করবেন। রায়েরবাজার জলাভূমিতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ সম্ভবপর ছিল না তাই মিরপুর বধ্যভূমিতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের স্থান নির্ধারিত হয়েছিল। যেমন কথা, তেমন কাজ। স্মৃতিসৌধের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগ দ্বারা। ছয় মাসের মধ্যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ শেষ করেছিল সরকারের নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ তবে আনুষঙ্গিক পরিবেশ সৃষ্টির কাজ শেষ না হওয়াতে ১৯৭৪ সালের ১৪ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ২৪ ডিসেম্বর মিরপুর স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনের দিন ধার্য করা হয়।

১৯৭৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর সকাল দশটায় মিরপুর গোরস্থানের নিকটে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. নীলিমা ইব্রাহিম, উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের অবদান ও আত্মত্যাগের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)